بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৫ জুলাই, ২০২৪ মোতাবেক ০৫ ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ দুটি যুদ্ধের উল্লেখ করব। প্রথম যুদ্ধের নাম হলো বদরুল মওয়েদ এর যুদ্ধ, যা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ বদরুল মওয়েদ, বদরুস্ সানীয়া, বদরুল আখেরা এবং বদরুস্ সুগরা নামেও প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইবনে হিশাম এবং ইবনে ইসহাক-এর মতে মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনের শাবান মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওয়াকদী-র মতে এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনের যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা যাবার পর হয়েছে। আর বদরে যিলকদ মাসের এক থেকে আট তারিখ পর্যন্ত হাট বসতো। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) শাওয়াল মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। অর্থাৎ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মহানবী (সা.) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার রাতে বদরের ময়দানে পৌঁছেন। যাহোক, উক্ত তিনটি বর্ণনা অনুযায়ীই এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে হয়েছে, যদিও মাসের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এ প্রেক্ষিতে লিখেছেন যে, চতুর্থ হিজরী সনে শাওয়াল মাসের শেষের দিকে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীর একটি দলকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন।

এই যুদ্ধের কারণ হলো, আবু সুফিয়ান বিন হারব উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় উচ্চৈঃস্বরে বলেছিল যে, আগামী বছর আমাদের এবং তোমাদের সাক্ষাৎ বদরুস্ সুফরা নামক স্থানে হবে। বদরকে বদরুস্ সুফরা-ও বলা হয়। আমরা সেখানে যুদ্ধ করব। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে বলেন যে, হ্যাঁ, তাকে বলো, ইনশাআল্লাহ্। আল্লামা বায়যাভী লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং উত্তর দিয়েছিলেন, ইনশাআল্লাহ্। বদর, মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে একটি প্রসিদ্ধ কূপ, যা সাফরা এবং জার উপত্যকার মাঝে অবস্থিত। বদর মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটি হলো এই জায়গার অবস্থান। অজ্ঞতার যুগে এখানে প্রতি বছর যিলকদ মাসের এক তারিখ থেকে আট দিন পর্যন্ত একটি বড়ো মেলা বসতো। যদিও আবু সুফিয়ান অহংকারবশত এই ঘোষণা করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন যতই প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হচ্ছিল আবু সুফিয়ান মোকাবিলাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু এমন ভাব করছিল যে, সে অনেক বড়ো এক বাহিনী নিয়ে তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, যেন এই সংবাদ মদীনাবাসীদের কাছে পৌঁছে যায় আর আরবের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে আর মুসলমানদের এর মাধ্যমে ভয় দেখানো যায়। এরই মাঝে বনু আশজা'আ গোত্রের সদস্য এক ব্যক্তি নুয়াইম বিন মাসঊদ মক্কায় যায়। সে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে সেখানে আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে আর বলে, আমি মক্কায় এই উদ্দেশ্যে এসেছি যেন তোমাকে মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত করতে পারি। আমি নিজে দেখেছি যে, তাদের কাছে অগণিত অস্ত্র, উট এবং ঘোড়া রয়েছে। আর তারা তাদের মিত্র গোত্রকেও সাথে নিয়েছে। এখন তারা একান্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। দেখো! তুমি নিজে মোকাবিলার জন্য আহ্বান করেছিলে, এখন উক্ত

প্রতিশ্রুতির সময় নিকটে চলে এসেছে, অতএব তোমরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করো। আবু সুফিয়ান কথা এড়িয়ে বলে, হে নুয়াইম! তুমি জানো যে, আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছে। দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টি হয় নি, জলাধারগুলো শুকিয়ে আছে, চারণভূমিগুলোতে পশুপাল ও বাহনের পশুগুলোর জন্য ঘাসের খড়কুটা পর্যন্ত নেই। চতুর্দিকে খাদ্যাভাব রয়েছে। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হলো, আমরা এই দিনগুলো পার করে নেই। আর এর জন্য তুমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারো। অর্থাৎ তার কাছে সাহায্য চায় যে, তুমি মদীনায় গিয়ে মানুষের কাছে আমাদের সংকল্প ও জনবল সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলো এবং তা অনেক বেশি প্রচার করো, যেন আমাদের সম্মানও রক্ষা পায় আর মুসলমানরা নিজেরাই ভয়ে বদরের দিকে না আসে। নুয়াইম বলে, এর বিনিময়ে আমাকে কী দেবে? আবু সুফিয়ান বিশটি উট দেয়ার প্রস্তাব দেয়, যা নুয়াইম সানন্দে গ্রহণ করে নেয় আর বলে, এই পুরস্কার সুহায়েল বিন আমর-এর কাছে প্রদান করা হোক, তারপর আমি এই কাজের জন্য যাব। সুহায়েল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার নিশ্চয়তা দেয়ার ফলে নুয়াইম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাকে দ্রুতগামী উট দেয়া হয় যেন এই পরিকল্পনাকে দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়ন করা যায়। নুয়াইম যাত্রার প্রস্তুতি নেয় আর মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে উমরা করে মাথা মুণ্ডন করে রেখেছিল এবং মদীনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। সে যত দ্রুত সম্ভব মদীনায় পৌঁছতে চাচ্ছিল যেন পাছে ইসলামী বাহিনী মদীনা থেকে বেরিয়ে না পড়ে। অতএব সে যখন মদীনায় পৌঁছে তখন মুসলমানরা একান্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। মুসলমানরা তাকে জিজ্ঞেস করে, নুয়াইম! কোথা থেকে এসেছো? সে বলে, আমি মক্কা থেকে উমরা করে এসেছি। তারা বলে, তাহলে তো আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তোমার জানা থাকবে। তার যুদ্ধের প্রস্তুতি কেমন? সে বলে, আবু সুফিয়ান তো অনেক বড়ো বাহিনী একত্রিত করে নিয়েছে। পুরো আরবকে নিজের সাথে যুক্ত করেছে। সে অনেক অত্যুক্তি করে বলে, সে এত বড়ো বাহিনী নিয়ে আসছে যে, এর মোকাবিলা করা তোমাদের জন্য সম্ভব নয়। আমার মতে তোমরা মদীনাতেই অবস্থান করো, যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বাহিরে যেও না। সে এত বড়ো বাহিনীসহ আক্রমণ করতে যাচ্ছে যে, তার হাত থেকে কেবল সে-ই বাঁচতে পারবে যে পলায়ন করবে। তোমাদের নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করা হবে। স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) এত বেশি আঘাত সইতে পারবেন না। তোমরা কি মদীনা থেকে বেরিয়ে মৃত্যুর মুখে যেতে চাও? পরিতাপ যে, তোমরা নিজেদের জন্য অনেক মন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছো। খোদার কসম, আমি মনে করি না যে, তোমাদের কেউ বাঁচতে পারবে। সে খুবই হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে যেন তারা ভয় পেয়ে যায়। সে এমনভাবে কথার অতিশয়োক্তি করে যে, কখনো আবু সুফিয়ানের প্রস্তুতকৃত সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের উল্লেখ, কখনো তাদের অস্ত্রের ভাণ্ডারের বর্ণনা, কখনো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের উৎসাহ উদ্দীপনার গল্প, কখনো তাদের ভয়ানক যুদ্ধকৌশলের প্রশংসা করতে থাকে। সে এত নৈপুণ্যের সাথে নিজ কার্য পরিচালনা করে যে, কয়েক দিনেই মদীনার পরিবেশ ভয় ও ভীতিতে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। নুয়াইম বিন মাসঊদ-এর কৌশল কার্যকরী প্রমাণিত হয়। দুর্বল ঈমানের মুসলমানরা তার গুজবসমূহের কারণে আসলেই ভয় পেয়ে যায়। এমনকি যে-ই কথা বলতো, সে নুয়াইম বিন মাসঊদ-এর কথার সত্যায়ন করতো। প্রতিটি সভায় আবু সুফিয়ানের বিশাল বাহিনী ও ভয়াবহ প্রস্তুতির আলোচনা চলছিল। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে ইহুদী ও মুনাফিকদের আনন্দ বাঁধ মানছিল না। আর তারা একে অপরকে এই সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, এখন ইসলামের অনুসারীদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। মদীনার এই পরিস্থিতির সময়ে হযরত আবু

বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন। তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন, স্বীয় নবী (সা.)-কে সম্মান দেবেন। আমরা জাতির সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম আর আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ পছন্দ করি না। তারা অর্থাৎ কাফিররা এটিকে কাপুরুষতা মনে করবে যদি আমরা সেখানে অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে না যাই। আপনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে চলুন। খোদার কসম! এতে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত। এরূপ আবেগপূর্ণ কথা শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, **ওয়াল্লাযি নাফসী বেইয়াদিহি লাআখরুজান্না ওয়া ইন লাম ইয়াখরুজ মায়ীআ আহাদুন**। অর্থাৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি একজনও আমার সাথে বের না হয় তবুও আমি অবশ্যই বের হবো। মুসলমানরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দৃঢ়তা ও সাহস এবং উদ্যম দেখার পর তাদের ভয় ও ভীতি দূর হয়ে যায়। আর তারা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে প্রস্তুতি নিতে থাকে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ যুদ্ধ সম্পর্কে অর্থাৎ গযওয়ায়ে বদরুল মওয়েদ সম্পর্কে লিখেছেন, উহুদের যুদ্ধে বিজয় লাভ এবং এত বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান বিন হারবের হৃদয় ভীতত্রস্ত ছিল আর ইসলামের ধ্বংসের বাসনা থাকা সত্ত্বেও সে চাইত, এক বিশাল দল প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মুসলমানদের মুখোমুখি না হয়। অতএব, মক্কায় থাকা অবস্থায়ই সে নুয়াইম নামক নিরপেক্ষ একটি গোত্রের সদস্যকে মদীনা অভিমুখে প্রেরণ করে এবং সে জোরালোভাবে বলে, মুসলমানদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা সত্য-মিথ্যা গল্প বানিয়ে যেভাবেই হোক তাদেরকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে বিরত রাখবে। অতঃপর এই ব্যক্তি মদীনায় আসে এবং কুরাইশের প্রস্তুতি, শক্তিমত্তা এবং তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অলীক গল্প শুনিয়ে মদীনায় এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে ভয় পেতে আরম্ভ করে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন (যুদ্ধাভিযানে) বের হওয়ার আহ্বান জানান এবং তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এ সময় বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তাই আমরা এ থেকে পিছু হটতে পারি না আর আমাকে যদি একাও যেতে হয় তবু আমি যাব এবং শত্রুর মোকাবিলায় একাই দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হবো– (একথা শুনে) লোকজনের ভীতি দূর হতে থাকে আর গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সাথে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। (অর্থাৎ) পুনরায় প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়।

যাহোক, আবু সুফিয়ানের সেনাদলের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ এবং খাঁটি মুসলমান পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। যাহোক, হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দুজনকেই ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে থাকবেন অথবা এটিও হতে পারে যে, আব্দুল্লাহ্ নাম শুনে বর্ণনাকারীরা সংশয়ে পড়েছেন। কেউ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বলেছেন আর কেউ বা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার (নাম) উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁর পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন এবং পনেরশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সেনাদলে দশজন অশ্বারোহী ছিলেন। একটি ঘোড়া মহানবী (সা.)-এর জন্য (নির্ধারিত) ছিল। এছাড়া হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আবু কাতাদা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত

মিকদাদ বিন আসওয়াদ, হযরত হুব্বাব বিন মুনযের, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)-এর কাছে ঘোড়া ছিল।

মুসলমানরা তাদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মুসলমানরা যখন বদরের প্রান্তরে পৌঁছেছিল তখন যিলকদের চাঁদ উদিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের বাণিজ্যিক পণ্য এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র সাথে নিয়ে যাওয়া (মূলত) তাদের দৃঢ়প্রত্যয়, সাহসিকতা এবং অটল বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে আর এটিও অসম্ভব নয় যে, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা বা ইঙ্গিতেই তারা নানাবিধ বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। অর্থাৎ (তাদের বিশ্বাস ছিল,) সম্ভবত আবু সুফিয়ান মোকাবিলা করতে আসবেই না আর এলেও চরমভাবে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যাবে এবং সেই দিনগুলিতে সেখানে যে মেলা বসতো মুসলমানরা তাতে ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করে লাভবান হবে, আর বাস্তবেও এমনটিই হয়।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় অবস্থান করেছিলেন। এমন সময় মাগশী বিন আমর যামরী মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে। সে বনু যামরা গোত্রের নেতা ছিল আর দ্বিতীয় হিজরীতে মুসলমানদের সাথে এই গোত্রের একটি চুক্তি হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি (সা.) বনু যামরার ওপর আক্রমণ করবেন না আর বনু যামরাও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না আর অন্য কারও পদক্ষেপে অংশগ্রহণও করবে না, এছাড়া তাঁর কোনো শত্রুকে তারা সাহায্যও করবে না। সে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি কি এ ঝরনায় কুরাইশের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন? এই আলোচনা থেকে মহানবী (সা.) ধারণা করতে পারেন, এই ব্যক্তি কুরাইশের প্রতি অনুরক্ত। (তখন) তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, হে বনু যামরার ভাই! তুমি চাইলে আমাদের পরস্পরের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তি বাতিল করে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করে দেন। (একথা শুনে) মাগশী বলে, হে মুহাম্মদ (সা.), আল্লাহ্‌র শপথ! আপনাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সাক্ষাতে মহানবী (সা.) প্রজ্ঞা ও বীরত্বের সাথে এই গোত্রের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন যে, আমাদের মাঝে সন্ধিচুক্তি কোনো প্রকার কাপুরুষতা বা দুর্বলতার কারণে সম্পাদিত হয় নি। এছাড়া উহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে বিভিন্ন গোত্র যে তাদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছিল তাদের ওপর মহানবী (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সফলতার সাথে মুসলমানদের শক্তি ও সাহসিকতার প্রভাব প্রতিপত্তি পুনর্বহাল করেন।

অঙ্গীকার অনুযায়ী মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে পৌঁছে গেলেও আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতাদের বলে, আমি নুয়াইম বিন মাসঊদকে পাঠিয়ে দিয়েছি; অভিযানে বের হবার পূর্বেই সে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে দেবে। সে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবুও আমরা এক বা দুরাতের জন্য (মক্কা হতে) বের হবো আর এরপর আমরা ফিরে আসবো। মুহাম্মদ (সা.) অভিযানে বের না হলে আমরা নিশ্চিন্তে বলে দেব, আমরা তো গিয়েছিলাম কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা আসে নি, আর এভাবে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। তবে তারা যদি অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তাহলে আমরা এমন ভাব দেখাবো যে, এটি দুর্ভিক্ষের বছর, তাই আমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের বছরে (অভিযানে) বের হওয়া উপযুক্ত হবে। আর একথা বলে পথ থেকেই আমরা ফিরে আসবো। একথা শুনে কুরাইশরা বলে, এটি উত্তম পরামর্শ। কথা মতো আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফিরদের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করে

আর তাদের সংখ্যা ছিল দুহাজার। তাদের কাছে পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিল। **'মার্‌রুয্‌ যাহরান'** উপত্যকার **'মাযান্না'** নামক ঝরনার কাছে এই সেনাদল শিবির স্থাপন করে। 'মার্‌রুয্‌ যাহরান' মক্কা থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। দুর্ভিক্ষের দরুন কুরাইশের অর্থনৈতিক অবস্থা আসলেই খারাপ ছিল এবং তাদের আয়-উপার্জনের উৎস কমে গিয়েছিল। এ জন্য নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে, অর্থাৎ বদরের প্রান্তরে পৌঁছার সাহস তাদের হচ্ছিলো না। কিন্তু লজ্জিত হবার ভয়ে এই সেনাদলটি যাত্রা করে। তাদের সেনাপতি মক্কা থেকেই ক্লান্তশ্রান্ত ও হতাশ ছিল। সে মুসলমানদের সাথে আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে বার বার ভাবছিল আর তাদের ভয়ে কাঁপছিল। 'মার্‌রুয্‌ যাহরান' পৌঁছার পর তার মনোবল ভেঙে যায় এবং ফিরে যাবার জন্য সে অজুহাত খুঁজতে থাকে। অবশেষে সে তার সেনাদলের মাঝে ফিরে যাবার ঘোষণা দেয়ার জন্য এবং এর বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। সে বলে, হে কুরাইশের লোকেরা! যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধির বছর উত্তম হবে, যাতে তোমরা পশুর পাল চরাতে পারবে এবং নিজেরাও দুধ পান করতে পারবে। বর্তমানে খরা চলছে। তাই আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো। আবু সুফিয়ানের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করে সবাই ফিরতি পথ ধরে আর কেউই যাত্রা অব্যাহত রাখার বা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার মত ব্যক্ত করে নি। যা থেকে বুঝা যায়, গোটা সেনাদলের ওপরই মুসলমানদের ভীতি ছেয়ে ছিল। অঙ্গীকার অনুযায়ী আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে আট দিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন। এ যুদ্ধের জন্য তিনি (সা.) সর্বমোট ষোলো রাত মদীনার বাইরে থাকেন। শত্রুরা মোকাবিলা করার সাহসই পায় নি এবং তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। মুসলমানদের মনোবল দৃঢ় হয়। এ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানীয় কাফির মক্কার কুরাইশের প্রতি অনুরক্ত ছিল। মহানবী (সা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের কাছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প ব্যক্ত করলে তারাও সতর্ক হয়ে যায়। বদরের কোনো কোনো ব্যাবসায়ী বাণিজ্য শেষে মক্কায় ফিরে গিয়ে আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের সুদৃঢ় অবস্থানের কথা সবিস্তারে অবগত করে। ফলে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা তাদের কাপুরুষতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য খুবই লজ্জিত হয়। এই অভিযানে কার্যত কোনো যুদ্ধ না হলেও মুসলমানদের সম্মান ও আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং শত্রুর ওপর (তাদের) প্রতাপ অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ প্রসঙ্গে লেখেন,

মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীসহ মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর অপর দিকে আবু সুফিয়ান তার দুই হাজার সৈন্যসহ মক্কা থেকে যাত্রা করে। কিন্তু ঐশী অভিপ্রায়ে যা ঘটে তা হলো, মুসলমানরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরে গিয়ে উপনীত হয় ঠিকই, কিন্তু কুরাইশ সেনাদল কিছুদূর এসে পুনরায় মক্কায় ফিরে যায়। আর এই ঘটনার বিবরণ অনেকটা এমন যে, আবু সুফিয়ান যখন নুয়াইমের ব্যর্থতার খবর পায় তখন সে মনে মনে ভয় পায় এবং নিজের সেনাদলকে এই উপদেশ দিয়ে পথ থেকে ফেরত নিয়ে যায় যে, এ বছর চরম দুর্ভিক্ষ আর মানুষ অভাবে আছে; তাই এ সময় যুদ্ধ করা ঠিক নয়। যখন স্বাচ্ছন্দ্য আসবে তখন অধিক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। ইসলামী সেনাদল আট দিন পর্যন্ত বদর (প্রান্তরে) অবস্থান করে আর সেখানে যেহেতু যিলকদ মাসের শুরুতে প্রতি বছর মেলা বসতো তাই সেই দিনগুলোতে অনেক সাহাবী সেই মেলায় ব্যবসা করে অনেক মুনাফা অর্জন করে। এমনকি তারা এই আট দিনের ব্যবসায় নিজেদের মূলধন দ্বিগুণ করতে সমর্থ হয়। মেলা শেষ হয়ে যাবার পরও যখন কুরাইশ সেনাদল আসলো না তখন মহানবী (সা.) বদর থেকে যাত্রা

করে মদীনায় ফিরে আসেন আর কুরাইশরা মক্কায় পৌঁছে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে।

[কুরাইশরা (মক্কায়) ফেরত গিয়ে লজ্জা ঢাকার জন্য এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। যাহোক, এই যুদ্ধের পরিণাম এমনই হয়।]

দ্বিতীয় যুদ্ধাভিযান হলো দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধাভিযান। পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়। দূমাতুল জান্দাল মদীনা থেকে প্রায় চারশ পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই যাত্রা প্রায় পনের থেকে সতেরো দিনে সম্পন্ন হতো। এটি মদীনার উত্তরে সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী স্থান ছিল। এখানে বনু কুযাআ' গোত্রের শাখা বনু কালব-এর লোকেরা বসবাস করতো। এখানে অনেক বড়ো বাণিজ্যিক হাট বসতো যেটি বনু কালব গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। দূমাতুল জান্দাল নামকরণের কারণ হলো, সেখানে একটি দুর্গ ছিল যেটি বিশেষ ধরনের পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। দূমাহ শব্দটি সেই জায়গার জন্যও ব্যবহৃত হয় যেখানে বন্যার ঢল বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে সৃষ্ট গোলাকার পাথর বহুল পরিমাণে জমা হয়ে যায়। এই জায়গাকে দূমাহ বলার আরেকটি কারণ হলো, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দুই পুত্র দূমাহ অথবা দূমানের প্রতি এটি আরোপিত হয়। যাহোক, এগুলো হলো উক্ত স্থানের নামকরণের (ঐতিহাসিক) পটভূমি।

এই যুদ্ধাভিযানের ইতিহাস এবং সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে লেখা আছে, সকল ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারদের মতে পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়ালের ২৫ তারিখে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপট কী ছিল– এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, এখন পর্যন্ত বিরোধীদের সাথে যতগুলো যুদ্ধাভিযানের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো কমবেশি মদীনা ও হেজায অঞ্চলের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটিই প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল যেটি মদীনা থেকে প্রায় পনের দিনের দূরত্বে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়া প্রদেশের সীমান্তবর্তী স্থানে সংঘটিত হতে যাচ্ছিল। এর প্রেক্ষাপট হলো, মুসলমানদের কাছে উপর্যুপরি পরাজিত হয়ে এবং মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভব করে ধর্মের শত্রুরা এমন একটি সুযোগের সন্ধানে ছিল যেন তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের সমূলে উৎপাটন করতে পারে। এই অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য মদীনার একেবারে উত্তরে সিরিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন দূমাতুল জান্দালের চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলো ইসলামী রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে একটি বিশাল সেনাদল গঠন করতে আরম্ভ করে। (তারা চ্যালেঞ্জ দেয় যে, আমরা মদীনায় আক্রমণ করব)। এরা বাণিজ্য কাফেলাকে লুট করতো। [তারা কেবল চ্যালেঞ্জ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং নৈরাজ্যও সৃষ্টি করে রেখেছিল এবং বাণিজ্য কাফেলা লুট করতো]। যে মুসলমানকেই পেতো, তাকেই বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিতো। মহানবী (সা.)-কে দূমাতুল জান্দালের এসব গোত্রের উল্লিখিত সব অপকর্মের সংবাদ দেওয়া হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দূমাতুল জান্দালের গোত্রগুলো কোনো বিশাল সেনাদল গঠন করে মদীনায় আক্রমণ করার পূর্বেই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদেরকে এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া উত্তম হবে যেন তারা মদীনায় আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে এবং বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে সিরিয়ায় পৌঁছতে পারে।

এর প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে সেনাদল গঠন করে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং হযরত সিবা বিন উরফাতাহ্ গিফারী (রা.)-কে মদীনায় (তাঁর) স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন আর মহানবী (সা.) এক হাজার সাহাবী সমন্বিত সেনাদল নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি (সা.) সারা রাত সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। **বনু উযরার** এক সদস্য পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর (সা.) সাথে ছিল। তার নাম ছিল **মাযকূর**।

সে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ছিল। সে ত্বরিত রওয়ানা হয় এবং সে সফরের জন্য অপরিচিত পথ বেছে নেয় যেন শত্রুরা টের না পায়। মহানবী (সা.) যখন দূমাতুল জান্দালের নিকটে পৌঁছেন তখন পথপ্রদর্শক বলে, এটি বনু তামীম গোত্রের চারণভূমি। এখানে তাদের উট ও গবাদি পশু রয়েছে। আপনি এখানে অবস্থান করুন আর আমি খবরাখবর নিয়ে আসি। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে। এরপর **উযরী** তথ্য সংগ্রহের জন্য একাই বের হয়ে যায়। সেখানে চতুষ্পদ প্রাণী ও ছাগলের চিহ্ন দেখতে পায় এবং এটিও দেখে যে, তারা তাদের আশ্রয়স্থলে লুকিয়ে আছে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফেরত আসে এবং এই সংবাদ দেয় যে, সে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পেরেছে। মহানবী (সা.) সেখান থেকে রওয়ানা হন এবং তাদের পশুপাল ও রাখালের ওপর আক্রমণ করেন; এর মধ্য হতে কিছু করতলগত করেন এবং বাকিগুলো পালিয়ে যায়।

দূমাতুল জান্দালের লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যারা সেখানে লুকিয়ে ছিল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মহানবী (সা.) তাদের ময়দানে শিবির স্থাপন করেন। মহানবী (সা.) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন দলকে চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। ইসলামী সেনাদল নিরাপদে মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে আসে। প্রত্যেক দল কিছু উট সঙ্গে করে নিয়ে আসলেও তারা কোনো মানুষ (খুঁজে) পায় নি। তাদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাদের মধ্য হতে একজনকে মহানবী (সা.)-এর নিকট ধরে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির কাছে তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, গত রাতে তারা যখন জানতে পারে যে, আপনি তাদের পশুপাল ধরে নিয়ে গেছেন– তখন তারা পালিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) তাকে ইসলামের (প্রতি) আহ্বান জানালে সে মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন। দূমাতুল জান্দালের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে লেখেন, দূমাতুল জান্দাল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা ছিল এবং মদীনা থেকে এর দূরত্ব ১৫-১৬ দিনের কম ছিল না। এই যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপট হলো, মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, দূমাতুল জান্দালে অনেক লোকজন একত্রিত হয়ে লুটপাট করছে আর যে পথিক ও কাফেলা প্রভৃতি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে উত্যক্ত করে এবং তাদের মালামাল লুট করে নেয়। আর পাশাপাশি এই আশঙ্কাও সৃষ্টি হয়েছে যে, পাছে এই লোকেরা আবার মদীনা অভিমুখী হয়ে মুসলমানদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, মহানবী (সা.)-এর সামরিক অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। [মহানবী (সা.)-এর সমরাভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা।] তাই যদিও এদের এই লুটপাট প্রকৃত অর্থে মদীনার মুসলমানদের জন্য কোনো আশঙ্কার কারণ ছিল না, তথাপি তিনি (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ প্রদান করেন, এই ডাকাতি ও অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য সেখানে যাওয়া উচিত। কাজেই, মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে এক হাজার সাহাবী এই দূরদূরান্তের কষ্টদায়ক সফর করে তাঁর (সা.) সাথে যান। আর তিনি (সা.) পঞ্চম হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং ১৫-১৬ দিনের দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক দূরত্ব অতিক্রম করে দূমাতুল জান্দালের নিকটে পৌঁছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা যায় যে, এরা মুসলমানদের আগমনবার্তা পেয়ে এদিক–সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল আর যদিও মহানবী (সা.) সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং তিনি (সা.) ছোটো ছোটো সৈন্যদলও বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন, যেন সেসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়, কিন্তু তারা এমনভাবে নিখোঁজ হয়ে

যায় যে, তাদের কোনো চিহ্নও তারা খুঁজে পায় নি। যদিও তাদের একজন রাখাল মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে মহানবী (সা.)-এর তবলীগে মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফেরত আসেন।

দূমাতুল জান্দাল থেকে ফেরত আসার বিষয়ে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) প্রায় তিন দিন অবস্থানের পর পুরো সেনাবাহিনীর সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ২০ রবিউস সানী তারিখে মদীনায় ফিরে আসেন। একজন লেখক দূমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিপটে এ যুদ্ধের বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। এটি নিজ সত্তায় যদিও যুদ্ধ ছিল না, তথাপি এর মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপের উত্তর দিকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার এবং পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ হয়। গোটা আরব উপদ্বীপে ক্ষমতার মূল উৎসসমূহের অন্বেষণ করাও এর লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একইসাথে দূমাতুল জান্দাল-এর যুদ্ধাভিযান স্বীয় পরিণাম ও ফলাফলের দিক থেকেও অনেক কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়। সেখানকার পুরো অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় আর এটিই উদ্দেশ্য ছিল যেন এলাকা সম্পর্কে জানা যায়, অধিকন্তু সেখানে যে অন্যায় হচ্ছে তা-ও নির্মূল করা যায়। যাহোক, তিনি লেখেন, কার্যত না হওয়া এই যুদ্ধ ঐশী অনুগ্রহের অধীনে মুসলমানদের জন্য আগামী দিনের বিজয় ও সাহায্যের ফলাফল একত্রিত করছিল। এটি একটি সামরিক অভিযান ছিল যা প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যুদ্ধের দ্বার রুদ্ধকরণ ছিল। মূলত যুদ্ধ হবার যে সম্ভাবনা ছিল সেটিকে দূর করার জন্য এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, কেননা এতদঞ্চলের অনেকগুলো আরব গোত্র মদীনায় আক্রমণের সংকল্প রাখত। এছাড়া এটি একটি রাজনৈতিক যুদ্ধও ছিল– যা সেসব গোত্রের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করেছে যারা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়কে কাজে লাগিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হবার স্বপ্ন দেখছিল। এই যুদ্ধাভিযানের একটি উদ্দেশ্য আরবদের এ প্রবৃত্তিগত ভয় দূর করাও ছিল যে, তারা কখনো রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। [কেবল একটি উদ্দেশ্য নয়, বরং আরবদের মাঝে যে প্রবৃত্তিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, আমরা কখনো রোম সাম্রাজ্যের মোকাবিলা করতে পারব না– সেটিও এ যুদ্ধাভিযানের ফলে দূর হয়ে যায়।] তাদেরকে কার্যত এই বিশ্বাসে উপনীত করাও উদ্দেশ্য ছিল যে, তাদের বাণী পুরো বিশ্বের জন্য, (এটি) কেবল আরব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। এ যুদ্ধাভিযান মুসলমানদেরকে এ বিষয়েও আশ্বস্ত করে। এসব ত্বরিত ও দূরদর্শী পদক্ষেপ এবং সুদক্ষ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) ইসলামী রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জন করেন আর সময়ের স্রোতকে মুসলমানদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন এবং অনবরত যে–সব অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সেগুলোর প্রচণ্ডতা হ্রাস করেন, যা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। এই যুদ্ধাভিযানের ফলে অনেক বিরুদ্ধবাদীও বিরত হয়। অভ্যন্তরীণভাবে মুনাফিকরাও সংযত হয়, এমনকি মুনাফিকরা নিশ্চুপ ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে। আরবের বেদুঈনরা শিথিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা ইসলাম প্রচার ও সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভুর বাণী প্রচার করার সুযোগ লাভ করে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, যিনি **'সীরাতুন নবী'** বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, তিনি এ বিষয়ে লেখেন যে,

এ যুদ্ধাভিযান এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম যুদ্ধাভিযান ছিল যে, এর লক্ষ্য অথবা কমপক্ষে বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। দূমাবাসীদের সাথে মুসলমানদের কোনো বিবাদ ছিল না। তারা মদীনা থেকে এতটাই দূরে ছিল যে, বাহ্যত তাদের পক্ষ থেকে

এই আশঙ্কা কোনো প্রকৃত বিপদের কারণ হতে পারতো না যে, তারা এত দীর্ঘ সফরের কষ্ট স্বীকার করে মদীনায় মুসলমানদের চিন্তার কারণ হবে। অতএব তাদের মোকাবিলা করার জন্য পনেরো-ষোলো দিনের কষ্টদায়ক সফরের উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা তাদের এলাকায় ছিনতাই ও রাহাজানির যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল এবং নিরপরাধ কাফেলা ও যাত্রীদেরকে তারা যে উত্যক্ত করত– সেটির অবসান ঘটানো। সুতরাং মুসলমানদের এই অভিযান শুধুমাত্র জনকল্যাণ ও দেশের সামগ্রিক হিতসাধনের জন্য ছিল, যাতে তাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ দৃষ্টিপটে ছিল না। আর এটি সেসব লোকের উদ্দেশ্যে একটি ব্যবহারিক জবাব যারা নিতান্ত অন্যায় ও অবিচারের সাথে মুসলমানদের প্রাথমিক যুদ্ধাভিযানগুলোকে, যা তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে করেছিল, আক্রমণাত্মক বা ব্যক্তিস্বার্থজনিত বলে আখ্যায়িত করেছে। এই যুদ্ধাভিযানের একটি ফল তো এটি হয়েছে যে, এতে দূমাবাসী ভীত হয়ে তাদের নৈরাজ্যমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয় আর অত্যাচারিত মুসাফিররা এই অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে। আর দ্বিতীয়ত সিরিয়ার সীমান্তে, যেখানে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমানদের নামই পৌঁছেছিল আর মানুষ ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত ছিল, তারা ইসলামী রীতিনীতির সাথে পরিচিত হয় এবং সেই এলাকার লোকেরা মুসলমানদের রীতি ও সভ্যতা সম্পর্কে কিছুটা অবগত হয়। 'দূমাতুল জান্দাল'-এর আশপাশে কিছু খ্রিষ্টান বসতিও ছিল, কিন্তু রেওয়ায়েতসমূহে এটি উল্লেখ নেই যে, এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা কি খ্রিষ্টান ছিল নাকি মূর্তিপূজারি মুশরিক ছিল; কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সম্ভবত এই লোকেরা মুশরিক হয়ে থাকবে, কেননা এই অভিযান যদি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে হতো তাহলে ঐতিহাসিকরা অবশ্যই এর কথা উল্লেখ করত। অর্থাৎ খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদরা তো অবশ্যই এর উল্লেখ করত। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

মোটকথা, এসব যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে, এসব যুদ্ধাভিযান শত্রুদের অনিষ্টকে প্রতিহত করা ও তাদের দুরভিসন্ধিকে নিঃশেষ করা এবং সর্বজনীন নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, কোনো হত্যাযজ্ঞ ও অবৈধ হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে এবং শান্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে করা হয় নি। সুতরাং ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর যে অপবাদ রয়েছে এসব ঘটনা তার খণ্ডন করছে, কেননা যখন যুদ্ধ হলো না তখন মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে আসে এবং কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। আর মুসলমানদের এই অভিযানের ফলে অত্র এলাকাতে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এই নির্যাতন থেকে কেবল মুসলমান কাফেলাগুলোই পরিত্রাণ লাভ করে নি বরং অন্যান্য কাফেলাও পরিত্রাণ লাভ করেছে। এই দুটি যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা এখানেই শেষ হচ্ছে।

পুনরায় আমি দোয়ার প্রতি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। সেই শান্তি যার জন্য মহানবী (সা.)-ও স্বীয় যুগে চেষ্টা চালিয়েছেন, আর তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও এটিই ছিল এবং ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যও তা-ই। আর এই সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে হতে পারে। এর জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। বাহ্যত এটিই মনে হচ্ছে যে, জগদ্বাসী এখন নিজেদেরই পায়ে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত, বাহ্যিকভাবে শান্তির কোনো উপায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অপরদিকে এই পশ্চিমা দেশগুলোতেও এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড আরও বেশি জোরদার হচ্ছে আর ধারণা করা যাচ্ছে, আগামীতে হয়ত তা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেও মুসলমানদেরকে নিজেদের স্থায়ীত্বের উপকরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে একতাবদ্ধ হতে

হবে। নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তারা যেন এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।

মুসলমান দেশসমূহে যেমন সুদান ইত্যাদি দেশে মুসলমানরাই মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করছে, এর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও শান্তি প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিন। নিজেদের ধর্মের যে উদ্দেশ্য– সেটিকেই তারা ভুলে গেছে, নিজ ভাইদেরই তারা মারছে। আর এ কারণেই অমুসলিমরাও মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের আমিত্ব ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে দেশ ও জাতির সেবক হওয়ার তৌফিক দিন আর শান্তি বিনষ্টকারী হওয়ার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)